# ইতিহাস-ঐতিহ্যে রংপুর।

## পটভূমিঃ

মহাভারতের মৎস্যদেশ ও লৌহিত্যদেশ (ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বনাম লৌহিত্য) মূলতঃ আমাদের বৃহত্তর রংপুর জেলা অঞ্চল। অপরদিকে রামায়নে উলেস্নখিত প্রাগজ্যোতিষ রাজ্য কামরূপ রাজ্যের পূর্বনাম। আর কামরূপ রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল 'রত্নপীঠ'। আদিযুগের এই রত্নপীঠ রংপুরের প্রাচীন নাম। Sir Edward Gait এর History of Assam হতে জানা যায় রংপুর, কোচবিহার এক সময় কামরূপ রাজ্যের অমত্মর্গত ছিল।

**২৫°০৩′ উঃ অক্ষাংশ হতে ২৬°০০ উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫৭′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হতে ৮৯°৩২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যমত্ম বর্তমান রংপুর জেলা বিসত্মৃত। রংপুর শহরের পশ্চিমে ঘাঘট নদী প্রবাহিত।**

## নামকরণঃ

রংপুর বা রঙ্গাঁপুর নামকরণের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বহুসংখ্যক হলেও মোগল অধিকৃতের পূর্বে এই অঞ্চলের নামকরণে রংপুর বা রঙ্গাঁপুর শব্দটি পাওয়া যায়না। রংপুর বা রঙ্গাঁপুর নামকরণের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

- রঙ্গাঁ শব্দটি ফার্সী শব্দ। এর অর্থ প্রমোদ, রসিকতা, নাট্যকর্ম (রঙ্গাঁশালা)। প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে প্রাগজ্যোতিষপুর রাজাদের আমলে এ অঞ্চলে নট-নটি ও বারবনিতারা রঙ্গাঁলয়ের সাথে জড়িত ছিল। পরবর্তিতে মধ্যযুগ এবং ইংরেজ আমলেও বরেন্দ্র অঞ্চলের সামমত্ম রাজা জমিদারদের প্রমোদখানা ও ভোগ বিলাসের চিহ্ন পাওয়া যায়। বৃটিশ আমলে এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল যা আজকের পাবলিক লাইব্রেরী ভবন তার উদাহরণ। এধরনের রঙ্গাঁবসিকতার আধিক্যহেতু এতদঞ্চলের নাম রঙ্গাঁপুর এবং ভাষামত্মরে রংপুর হয়েছে।
- 'রঙ্গাঁ' শব্দটির অন্য একটি অর্থ যুদ্ধ। প্রত্মতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় মধ্যযুগের রংপুর অঞ্চলে অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘঠিত হয়েছে। তৎকালীন রাজধানী ঘোড়াঘাটকেন্দ্রিক যুদ্ধ ব্যতিত ১৬৮৭ সাল হতে ১৭১১ সাল পর্যমত্ম এই ভূ-খন্ডে অসংখ্য যুদ্ধ ঘটে গেছে। এজন্যই এ অঞ্চলের নাম হয়েছে জঙ্গাঁপুর বা রঙ্গাঁপুর।
- 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. নীহার রঞ্জন রায় রঙ্গাঁপুর নামকরণে লাল মাটি অধ্যুষিত বৌদ্ধ প্রভাবিত রংপুরের কথা বলেছেন। রংপুর অঞ্চলে লাল মাটি বা খিয়ারমাটির এলাকা অত্যন্ত সীমিত। সুতরাং লাল-মাটির আধিক্য অধ্যুষিত রংপুরের সংগে এ অঞ্চলের সাযুজ্য অত্যন্ত সীমিত।
- রংপুর জেলার অধিকাংশ অঞ্চলে তিসত্মা নদীর পুরাতন পস্নাবন ভূমি রয়েছে। এই তিসত্মা নদীর মধ্যযুগে দিসত্মাং নামে পরিচিত ছিল। দিস্তাং অঞ্চলে প্রায় দুই-তিন হাজার বছর আগে বিশেষ একটি ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা 'রং' ভাষা। অন্যদিক তিসত্মা বা দিসত্মাং নদীর আদিনাম রংপো বা রংপু। তাই রংপু বা তিসত্মার অববাহিকায় অবস্থিত বলে এর নাম রংপুর হতে পারে।

William Hunter এর Statistical Accounts of Rangpur District হতে জানা যায় ১৬৬০-৬১ সালে মোগল অধিকৃতের পর রংপুর অঞ্চলের নামকরণ হয় 'ফকির কুন্ডি'। অর্থাৎ মোগল অধিকৃতের পরে রংপুর নামকরণ হয়। সুতরাং রঙ্গাঁপুর বা রংপুর নামকরণের ঐতিহাসিক উৎপত্তি মধ্যযুগ। আর রংপুরের মধ্যযুগের ইতিহাস নানা যুদ্ধ-বিগ্রহে সমাচ্ছন্ন। অন্যদিকে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সামমত্ম সমাজে বাংলার প্রতিটি অঞ্চলেই রঙ্গাঁশালা, প্রমোদ উদ্যান ছিল। শুধু রংপুরেই রঙ্গাঁরসের আধিক্য হেতু নামকরণে প্রভাব ফেলেছে এমন ভাবনা অনেকেই সমর্থন করেননি। তাই রঙ্গাঁপুর নামকরণে মধ্যযুগীয় যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী যৌক্তিক বলে আমরা মনে করতে পারি।

## নগরায়ন

চতুর্দশ শতকের শুরম্নতে কামরূপ রাজ্য ভেঙ্গে কামতা রাজ্য তৈরী হয়। কামতারাজ্যের আরেকটি নাম কামতা বিহার। বর্তমান রংপুরের নয় কি.মি. পশ্চিমে মন্থনা মৌজায় কামতা রাজ্যের একটি প্রতিরোধ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে।

বর্তমান রংপুর শহর হতে পূর্ব দিকে তামপাট ইউনিয়ন পরিষদের এলাকাটি মীরগঞ্জ নামে পরিচিত। মীরগঞ্জ হলো মধ্যযুগ ও সুলতানী আমলের রঙ্গাঁপুরের আদি নগরায়ন। এলাকাটি এখনও বড় রংপুর মৌজা নামে এবং বাজারটি নগর মীরগঞ্জ নামে পরিচিত। মোগল আমলে রঙ্গাঁপুর শহর মীরগঞ্জ হতে উত্তরে মাহীগঞ্জ বাজার ভিত্তিক নগরীরূপে গড়ে ওঠে। মাহীগঞ্জের পূর্বাঞ্চল এখনও ছোট রংপুর নামে পরিচিতি।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সংগে সংগে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় রংপুর অঞ্চলেও রাজস্ব সংগ্রহে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এ সময়েই শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন শহরায়নের চিমত্মা-চেতনা প্রকাশ পায়। ১৭৯০ সাল হতে মধ্যযুগীয় রঙ্গপুর শহর মাহীগঞ্জ হতে বর্তমান নবাবগঞ্জ বাজার (গুদরী বাজার)-রাধাবলম্নভ ভিত্তিক আধুনিক শহরায়ন গড়ে ওঠা শুরম্ন হয়। ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবসেত্মর পর স্থানীয় জমিদার-জোতদারগণ নতুন শহরে কাচারী ঘরসহ নতুন নতুন স্থাপনা গড়ে তোলেন। ফলে শহরের শ্রী-বৃদ্ধি পায়। এভাবেই আজকের রংপুর শহরের গোড়াপত্তন।

ডিমলার জমিদারী ষ্টেটের মালিক রাজা জানকীবলম্নভ সেন রংপুর শহরকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করার উদ্দেশ্যে শহরের পানি নিষ্কাশনের জন্য ১৮৯০ সালে শ্যামাসুন্দরী খাল খনন করেন। ৯ মাইল দীর্ঘ এই খাল খননের প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন জমিদার আশুতোষ লাহিড়ী।

**নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ঃ**

নদীবিধৌত পাললভূমি নিয়ে গঠিত বলে রংপুর অঞ্চল অত্যমত্ম উর্বর সমভূমি। এ অঞ্চলে চাষ ও পশুপালনের সুবিধার্থে বহু বহিরাগত জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে। প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে এ অঞ্চলে বাস করত নিগ্রবুট জাতি যারা পশু পালন ও চাষাবাদ জানত না। প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে আসামের উপত্যাকা পার হয়ে অষ্ট্রিক জাতি এদেশে প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে তারা কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। রংপুর অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে রাজবংশী কোচ, মেচ, খেন প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব দেখা যায়।

**নদ-নদীঃ**

রংপুর অঞ্চলের প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র, তিসত্মা, করতোয়া, ঘাঘট, বাঙালী, ধরলা, যমুনেশ্বরী, আখিরা প্রভৃতি প্রধান। তিসত্মা ব্রহ্মপুত্রের উপনদী, ভারতের সিকিম রাজ্যে উৎপত্তি। তিসত্মার শাখা নদী করতোয়া। নদীগুলো উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত।

**ভাষা সংস্কৃতি-সাহিত্যঃ**

বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে গৌড়ীয় প্রাকৃত হতে গৌড়ীয় অপভ্রংশের মাধ্যমে। গৌড়ীয় অপভ্রংশের পরবর্তি সত্মর বঙ্গ-কামরূপী যা বাংলা ভাষার আদি সত্মর। এ কারণে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদে কামরূপী ভাষা তথা রংপুরের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী,
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেসী।
টালত, হাড়ীত শব্দে রংপুরী ভাষার আঞ্চলিকতা বিদ্যমান।

রংপুর অঞ্চলে শিক্ষিত জনেরা পরিশীলিত ভাষায় কথা বললেও গ্রামীণ জনগণ রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন। রংপুরে একটি বহুল প্রচলিত শব্দ 'বাহে'। বাহে শব্দের অর্থ বাপুহে, বাবা হে। ব্যক্তিকে সম্মানসূচক সম্বোধন। সাধারণত, ঠাট্টার সম্পর্ক ব্যতিত সকলকে বাহে বলা যেতে পারে। তবে অপরিচিত যে কোন ব্যক্তিকে এ অঞ্চলে বাহে বলা হয়। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য শব্দের আদিতে র-বর্ণের স্থলে অ-বর্ণ উচ্চারিত হয়। যেমন- অমপুর (রংপুর), অস (রস), অসুন (রসুন) ইত্যাদি।

পান-সুপারীর প্রচলন রংপুরের সংস্কৃতির একটি অংশ। সু-প্রাচীনকাল হতে এ অঞ্চলে প্রচুর পান ও সুপারী উৎপাদিত হয়। ছড়া ও খনার বচন গুলোতে ধান আর পানের কথা উদ্ধৃত থাকায় এ অঞ্চলে ধান আর পানের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। অন্যান্য খাবারের সাথে ভাত এ অঞ্চলের প্রধান খাদ্য।

ষোল চাষে মুলা তার অর্ধেক তুলা,
তার অর্ধেক ধান বিনা চাষে পান।

রংপুরের কুটির শিল্প এক সময় সারাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। নকশী কাঁথা, রেশম শিল্প, কাগজ শিল্প, মৃৎ শিল্প, বাঁশ ও বেতের হস্তশিল্পজাত পণ্য এক সময় বাহিরে রপ্তানি হতো। বর্তমানে তাঁত শিল্পের অন্যতম নিদর্শন নিশবেতগঞ্জের শতরঞ্জি সারাদেশে বিখ্যাত। শতরঞ্জির প্রতি অনুরক্ত রংপুর জেলা কালেক্টর মি. নিসবেত এর নামানুসারে শতরঞ্জি উৎপাদনের ক্ষেত্রভূমি নিসবেতগঞ্জের নামকরণ করা হয়।

ভাওয়াইয়া গান উত্তরাঞ্চল তথা রংপুরের সংস্কৃতির একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। লোকসংগীতের উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ এ ধারাটি এ অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। উত্তরাঞ্চলের কোচবিহার (পূর্বের কামরূপ) রাজ্যের রাজবংশীদেরকে ভাওয়াইয়া গানের স্রষ্টা বলা হয়। ভাও শব্দের অর্থ ভাব বা প্রেম। এই ভাও শব্দের সংগে ইয়া প্রত্যয় যোগে ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি বলে প্রচলিত আছে। ভাওয়াইয়া মূলত ভাব বা প্রেম সমৃদ্ধ এক ধরনের প্রলম্বিত সূরের আঞ্চলিক লোকসংগীত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অসহায়ত্ব, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাংখা, প্রেম-প্রণয়ের আকুতি অব্যক্ত ব্যথা-বেদনা ভাওয়াইয়া গানের কথা ও সূরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'ফান্দে পড়িয়া' বগা কান্দেরে কিংবা

ওকি গাড়িয়াল ভাই কিসের মোর রাধন, কিসের মোর বাধন প্রভৃতি গানগুলিতে বিরহী নারীর ব্যথা-বেদনা প্রতীকী অর্থে তুলে ধরা হয়েছে। ভাওয়াইয়া গানের প্রধান শিল্পী ভাওয়াইয়া সম্রাট আববাস উদ্দিন। এছাড়া হরলাল রায়, রথিন্দ্রনাথ রায়, মহেশ চন্দ্র রায়, মোঃ কছিমুদ্দিন, কে.এস.এম আশরাফুজ্জামান সাজু, মোঃ সিরাজ উদ্দিন, রমজান আলী সরকার প্রমূখ ভাওয়াইয়া গান গেয়ে যশস্বী হয়েছেন। ভাওয়াইয়া ছাড়াও মেয়েলী গীত, বিয়ের গীত, মোনাই যাত্রা, গোয়ালীর গান, জারি গান প্রভৃতি এ অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

মধ্যযুগের পুঁথি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি হেয়াত মামুদ এর জন্মস্থান পীরগঞ্জ উপজেলার ঝারাবিশিলা গ্রামে। তার রচিত জঙ্গনামা মধ্যযুগের একটি বিখ্যাত কাব্য। বিভিন্ন সময়ে রংপুরের যে সব কবি-সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে তাদের সৃষ্টি দিয়ে অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে কবি হেয়াত মামুদ (অষ্টাদশ শতাব্দী), সাকের মামুদ (অষ্টাদশ শতাব্দী, ঘোড়াঘাট), কবি কালিচন্দ্র রায় চৌধুরী (কুন্ডির জমিদার), পন্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (ইটাকুমারী, পীরগাছা, ১৮৫২), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী (শালবন, রংপুর-১৮৯১-১৯৫১) প্রমূখ উলে-খযোগ্য। এছাড়া কর্মসূত্রে রাজা রামমোহন রায় ও যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রংপুরে অবস্থান করে তাদের উলে-খযোগ্য সাহিত্যগুলি রচনা করেন। যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯২৬সালে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরনার্থে প্রতিষ্ঠা করেন রামমোহন ক্লাব। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যয় তার দেবী চৌধুরানী উপন্যাস রংপুরে থেকে এ অঞ্চলের পটভূমিতে রচনা করেছেন। রংপুরের কবি সাহিত্যিকগণের মধ্যে কয়েকজন যেমন- মোতাহার হোসেন সুফী, কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯০১-১৯৯৪), আব্দুল হক খন্দকার (১৯২০-১৯৯৭), শেখ আমানত আলী (১৯২৯-১৯৭২), মোনাজাত উদ্দিন (১৯৪৫-১৯৯৬), সৈকত আসগর (১৯৫৪-২০০০), নুরুল ইসলাম (১৯৩৩-২০০৫), প্রফেসর মুহম্মদ আলীম উদ্দিন, ডঃ রেজাউল হক, আনিসুল হক, মহফিল হক, মফিজুল ইসলাম মান্টু, আনোয়ারুল ইসলাম রাজু, এম.এ বাশার, মনোয়ারা বেগম, মোহাম্মদ শাহ আলম, সোহরাব দুলাল, মতিউর রহমান বল্লিয়া কাব্যনিধি, খন্দকার সাইদুর রহমান, শাহ আব্দুল মজিদ বুলু, এস.এম খলিল বাবু, মোস্তফা তোফায়েল হোসেন প্রমূখ।

**খেলাধুলাঃ**

খেলাধূলায় রংপুর অত্যন্ত অগ্রসরমান। গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলি যেমন- হাডুডু, কাবাডি, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, লুকোচুরি, লাঠি খেলা, ঘুড়ি উড়ানো খেলা এখনও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। এছাড়া আধুনিক খেলা গুলোর মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেবিল-টেনিস প্রভৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে আছে। ফুটবলে রংপুরের ঐতিহ্য অত্যন্ত সমুজ্জল। ১৯৩২ সালে টাউন ক্লাবের আয়োজনে জি.এল শিল্ড ফুটবল প্রতিযোগীতায় অংশ নিতেন বাংলার বাইরের ফুটবল ক্লাবগুলো। ফুটবল যাদুকর সামাদ ছিলেন সেকালের নামকরা খেলোয়াড়। সম্প্রতি বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগীতায় রংপুরের পালিচড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়েদের দল জাতীয় পর্যায়ে রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৬০ সালে গঠিত হয় রংপুর টেবিল-টেনিস সংস্থা।

**রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম ও রংপুরঃ**

রংপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস অত্যমত্ম সমৃদ্ধ। পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় রংপুর অঞ্চলেও সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। মোগল আমলের স্থিতিশীল সামন্তবাদী সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর। এ সময় ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রংপুরে প্রথম প্রজা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন মন্থনার জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী, ইটাকুমারীর জমিদার শিবচন্দ্র রায়, ভবানী পাঠক, দিরাজী নারায়ন কৃপানাথ, ইসরাইল খাঁ, মুসা শাহ, নুরুল দীন ওরফে নুরুল উদ্দিন, দয়াল শাহ, কেনা সরকার। ইংরেজ ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নুরুল উদ্দিন বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অনেকেই তাকে সাহায্য করেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে রংপুর শহরের ষ্টেশন রোড, সালেক পেট্রল পাম্পের পাশে শহীদ হন মোহাম্মদ ওয়ালীদাদ খান। তিনি মোগল সম্রাটদের বংশধর ছিলেন। সালেক পেট্রল পাম্পের পাশে তার সমাধি আছে। রংপুরে স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন অনুশীলন সমিতির প্রধান রাজনৈতিক নেতা ছিলেন সতীশ পাকরাশী। রংপুরে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দান করেন তাদের মধ্যে জীতেন চক্রবর্তী, মাওলানা এহসানুল হক আফেদ্দী, কুড়িগ্রামের কাজী এমদাদুল হক, বদরগঞ্জের দারাজ উদ্দিন মন্ডল, মাহতাব উদ্দিন খান, হীরেন্দ্র নাথ মুখার্জী, জমিদার বিজয় বাবু, দীনেশ লাহিড়ী, বিমল ভৌমিক, নৃপেন ঘোষ, বেনী মাধব উকিল, দৌলতুন্নেছা, প্রতিভা সরকার প্রমূখ অন্যতম।

১৯৩৬-১৯৩৭ সাল হতে পরবর্তী সময় পর্যন্ত মুসলিম লীগের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ইমাদ উদ্দিন, রফায়েত উল্লাহ সরকার, শাহ আব্দুল হামিদ, আহমদ হোসেন, খয়রাত হোসেন, এম.এ আউয়াল, দবির উদ্দিন আহমেদ, আবুল হোসেন, মশিউর রহমান যাদু মিয়া, কাজী আব্দুল কাদের, কুড়িগ্রামের এম.এ হাফিজ প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনে রংপুরের নেতৃত্বে ছিলেন পীরগঞ্জের মতিউর রহমান, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, আব্দুল গনি এডভোকেট, আব্দুস সোবহান, খন্দকার আজিজার রহমান, মোতাহার হোসেন সুফি, শাহ আব্দুর রাজ্জাক, মোঃ আফজাল, এডভোকেট সিদ্দিক হোসেন, শাহ তোফাজ্জল হোসেন, আবেদ আলী, মিলি ভট্টাচার্য প্রমূখ।

পাকিস্তান আমলের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে রংপুরের আপামর জন সাধারণের যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে মনিকৃষ্ণ সেন, আমজাদ হোসেন, জীতেন দত্ত, মাহফুজ আলী জররেজ, পাখি মৈত্র, ভিকু চৌধুরী, এডভোকেট কাজী এহিয়া, এডভোকেট মোঃ আফজাল, গোলাম মোস্তফা বাটুল, হারেছ উদ্দিন সরকার, রফিকুল ইসলাম গোলাপ, হারেছ উদ্দিন সরকার, মমতাজ জাকির আহমেদ সাবু, অলক সরকার, ইলিয়াস আহমেদ, আবুল মনসুর আহমেদ, শহীদ মুখতার এলাহী, মাহবুবুল বারী, নুরুল হাসান, মুকুল মোস্তাফিজুর রহমান প্রমূখ।

মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে ৩রা মার্চ রংপুরে আলমনগর ষ্টেশন রোডে মিছিল চলাকালে অবাঙালী সরফরাজ খানের বাড়ী হতে গুলি বর্ষিত হলে কিশোর শংকু সমজদার নিহত হন। নিহত শংকু সমজদারের বাড়ি গুপ্ত পাড়ায় এবং তিনিই রংপুরের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শহীদ। ২৩ শে মার্চ রফিকুল ইসলাম গোলাপের নেতৃত্বে রংপুরে স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৮ শে মার্চ ১৯৭১ সালে রংপুরের আপামর জনতা তীর ধনুক নিয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে। সেদিনের ক্যান্টমেন্ট ঘেরাও আন্দোলনে প্রায় ৫০০ এর অধিক লোক মৃত্যুবরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসেবে যারা অংশগ্রহন করেন তাদের মধ্যে সিরাজ উদ্দিন, বলাই পাল, চায়না নিয়োগী, কবিতা দাস, কছিমুদ্দিন, ফজিলাতুনন্নেছা (বুলু আপা), অরুন মুখার্জী, মুকুল মোস্তাফিজুর রহমান, রামকৃষ্ণ সোমানী, শামসুন্নাহার রেনু, রনী রহমান (শহীদ), আহমেদ নুর টিপু, খাদিমুল ইসলাম বসুনিয়া প্রমূখ অন্যতম। রংপুরের বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে দমদমা ব্রিজ বধ্যভূমি, নিসবেতগঞ্জ বধ্যভূমি, দখিগঞ্জ শ্বশ্মান বধ্যভূমি, নন্দীগঞ্জ বধ্যভূমি, টাউন হলের গ্রীন রুম ও পার্শ্ববর্তী কুয়া, জাফরগঞ্জ বধ্যভূমি অন্যতম।

মুক্তিযুদ্ধকালীন রংপুরে শহীদ হন এমন কয়েকজন হলেন- মাহফুজ আলী জররেজ, কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক কাঁলাচাদ রায়, অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন রায়, অধ্যাপক সুনীল বরন চক্রবর্তী, অধ্যাপক সোলায়মান আলী, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ অধিকারী, অধ্যাপক আব্দুর রহমান, পূর্ণচন্দ্র সরকার, মাজাহার হোসেন, ভিকু চৌধুরী, মিলি চৌধুরী, শংকর লাল বনিক, মোবারক হোসেন, রনি রহমান, শহীদ মুখতার এলাহী, ওমর আলী, গোলাম গৌওছ, শিবেন মুখার্জী প্রমূখ।

**<u>দর্শনীয় স্থান ও স্থাপনাঃ</u>**

তাজহাট রাজবাড়ী ও রংপুর যাদুঘর, কারমাইকেল কলেজ, টাউন হল, পাবলিক লাইব্রেরী, দেবী চৌধুরানীর বসতবাটি ও সংলগ্ন মন্দির, ডিমলা রাজ কালী মন্দির, জেলা পরিষদ ভবন, শ্যামা সুন্দরি খাল স্মৃতিস্তম্ভ, রংপুর পুলিশ হল, জমিদার শিবচন্দ্রের বসতবাটি, মাওলানা কেরামত আলী (রঃ) এর মাজার ও কেরামতিয়া মসজিদ, বেগম রোকেয়ার জন্মভূমি পায়রাবন্দ, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য অর্জন ইত্যাদি।

রংপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংস্কৃতি অত্যন্ত সুপ্রাচীন। ইতিহাসখ্যাত রংপুরের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রাচীন হওয়ায় এর ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে নিরন্তর গবেষনা হলে অনেক নতুন তথ্য বের হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেই প্রতিশ্রুতি ও প্রস্তাবনা থাকবে সবার প্রতি।